‘সিরাজদৌল্লা’ ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ

অশোক চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র একবার দুঃখ করে বলেছিলেন ‘সাহেবরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়; কিন্তু বাঙালীর ইতিহাস হাস নাই।’ অন্যত্র তিনি আবার বলেছিলেন

এক্ষণে বাঙালীর ইতিহাস উদ্ধার করা কি অসম্ভব? নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু যে কার্য্যে ক্ষমতাবান বাঙালী অতি অল্প ...বা বু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমরা অন্তত এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি যে, তদ্বারায় আমাদের মনোদুঃখ অনেক নিবৃত্তি পাইবে। রাজকৃষ্ণ বাবুও একখানি বাঙালির ইতিহাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের দু ঃখ মিটিল না।
এবং মৃত্যুর আগে অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন
এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙালীর ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া একখানি বাঙ্গালীর ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

সরাসরি না বললেও, বঙ্কিমচন্দ্রের উপরোক্ত বক্তব্যের নির্যাসে ধরা পড়ে যে, ঔপনিবেশিক ভারতে এদেশের ইতিহাস বলে যা প্রচারিতহয়েছিল, বাস্তবিক তা ছিল ইংরেজদের শেখানো ইতিহাস। ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের প্রচারিত ও শেখানো ইতিহাসে এদেশীয় শিক্ষিত জমিদার, নব্য জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর আলোকপ্রাপ্ত অংশের প্রতিনিধিরা ইংরেজের শেখানো কথাকে সঠিক বলে ভাবতে, বুঝতে এবং মননশীলতায় প্রশ্রয় দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এদেশে বিদেশি ইংরেজ শাসক শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে এঁরা নিজেদের শ্রেণীগতস্বার্থের যে অভিন্ন সেতুবন্ধন ঘটিয়েছিলেন, তা ১৭৯৩ -এর কর্নওয়ালিসী ভূমি বন্দোবস্তের সুচিন্তিত পরিকল্পনার সাফল্যকেই সূচিত করেছিল। মুৎসুদ্দি বুদ্ধিজীবীদের এই অংশটি এদেশে বিদেশি ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর প্রতি অচল আনুগত্যের দর্শনগত অবস্থান থেকেই তাঁদেরপ্রচারিত কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ‘হিন্দু - নিপীড়ক’ অত্যাচারী ‘বিদেশি মুসলমান’ - দের বিদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণায় সোচচার হয়েছিলেন। ‘সুচিন্তিত দাসত্বে’র অবস্থান থেকে সরে এসে একবার মুক্তদৃষ্টির আলোকে এই প্রচার - প্রচারণার যৌক্তিকতাকে প্রাকুল করেননি। ১৭৫৭-র পলাশির ঘটনায় ইংরেজের জয়ে আনন্দে আত্মহারা এই শ্রেণীর প্রতিনিধিরা ভুলেই গিয়েছিলেন দেশের স্বাধীনতা এবং জাতীয়তার গুত্বপূর্ণ প্রসমূহকে। স্বভূমির পরদেশির করতলগত হওয়ার বিষয়টিকে তাঁরা স্বদেশের পরাধীনতা বলে ভাবতেই পারেননি। স্বয়ং রামনোহন তো এই দিদেশি ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ হিসাবে মান্যতা দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীও পলাশির ঘটনায় সিরাজের নিহত হওয়ার ঘটনার মধ্যে নিছক ‘দুরাচার নবাব’ - এর নিয়তিপ্রদত্ত পরিণতি বই কিছু খুঁজে পাননি।পলাশির ঘটনার কিছুকাল পরে সংঘটিত হিন্দু - মুসলমানদের যুক্ত - ঐক্যের ভিত্তিতে সংগঠিত যৌথ বিদ্রোহ, যা সন্ন্যাসী - ফকিরবিদ্রোহ নামে ইতিহাসে খ্যাত, তাকে বিকৃত করে বঙ্কিমচন্দ্র এই বিদ্রোহকে মুসলমান শাসন অবসানের লক্ষে ইংরেজকে ‘রাজা’ বানাবার জন্য হিন্দুদের সংগ্রাম বলে দেখিয়েছিলেন, যার সুদূরপ্রসারী ফল উত্তরকালে লক্ষ্য করা গেছে। পাবনা সিরাজগঞ্জে জমিদারদের অমানুষিক অত্যাচার - নিপীড়নের বিদ্ধে

ধর্ম - বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু - মুসলিম প্রজাবিদ্রোহের ঘটনাকেও ঠাকুর জমিদাররা সাম্প্রদায়িক চরিত্র দানকরে সমকালে সুচতুর রাজনীতি করে ইংরেজদের কায়েমি স্বার্থের সেবা করেছিলেন। তণ বয়সের রবীন্দ্রনাথের 'ব্রিটিশ বিজয় করিয়াঘে াষণা 'যে গায় গাক আমরা গাব না' গানটিতে 'ব্রিটিশ' এই শব্দের স্থলে 'মোগল' শব্দ বসিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন গানটিকে 'স্বপ্নময়ী' নাটকে সন্নিবেশিত করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদ না করে বরং মেনেই নিয়েছিলেন। স্বভ াবতই লক্ষণীয় যে, সিরাজকে বাঙলার তথা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পবিত্র সংগ্রামে নিহত বীর শহিদ হিসেবে না দেখে নিছক 'দুরাচার নবাব' হিসেবে দেখা, জগৎ শেঠ - রায়দুর্লভ - উমিচাঁদদের ঝিাসঘাতকতার বিষয়গুলিকে প্রচ ারধর্মিতায় না - এনে শুধুমাত্র মিরজাফর -এর বিদ্ধতা, সন্ন্যাসী - ফকির বিদ্রোহকে বিকৃতির মাধ্যমে মুসলমান বিরোধী হিন্দু সংগ্রাম হিসেবে প্রচার, ব্রিটিশ বিরোধিতার বিষয়টিকে মোগলবিরোধিতার বিষয় হিসেবে সন্নিবেশিত করার যে ম ানসিকতা এখানে সুপ্রকট, তা কি উনিশ শতকের হিন্দু ঃ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উত্থানের সঙ্গে সমন্বিত নয়? হিন্দু - মুসলমান নির্বিশেষে এদেশের নিম্নবর্গীয় মানুষের ব্রিটিশ বিরোধী গণবিদ্রোহের মধ্যেকার সম্প্রদায়গত সম্প্রীতিঋদ্ধ যে যুক্তঐক্যের শক্ত বাস্তবভিত্তি বর্তমান ছিল, তাকে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রচারধর্মিতার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করে ব্রিটিশবিরে াধী আন্দোলনকে দুর্বল করার যে ঐপনিবেশিক শাসকশ্রেণীর চক্রান্ত বর্তমান ছিল -- এই মানসিকতা কি তার সঙ্গেই স ম্পৃক্ত নয়?

বাঙলার প্রকৃত ইতিহাস না - থাকার প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের আক্ষেপের সঙ্গে সহমত পোষণ করা সম্ভব; কিন্তু 'মুসলমানের মসজিদ ভেঙে রাধামাধবের মন্দির গড়ার' ইচ্ছার প্রকাশক বঙ্গিমচন্দ্র বাঙলার ইতিহাস লিখলে সে - ইতিহাস কেমন হতে া, সে বিষয়ে আশঙ্কা থেকেই যায়। তবে সুখের কথা, ব্রিটিশের শেখানো ইতিহাসের বুলি - উদগার চিরস্থায়ী হয়নি। উনিশ শতকের অন্তিম পর্যায়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই প্রচলিত প্রচার ভেঙে প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে প্রকৃত ইতিহাস রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। এরকম একজন হলেন কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের সাহিত্যশিষ্য বিশিষ্ট ঐতিহা সিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যিনি ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের প্রত্যুষলগ্নে (জানয়ারি ২১-১৮৯৮) প্রকৃত ইতিহাসের অনুসন্ধানী ফসল হিসেবে প্রকাশ করে 'সিরাজদৌল্লা'। আর বাস্তবিক এই গ্রন্থটি নাট্যকার গিরিশচন্দ্রঘোষকে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক লিখতে, সম্ভবত সব চাইতে বেশি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল।

পলাশির ঘটনার ১১৮ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র সেন প্রকাশ করেন তাঁর 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যগ্রন্থ। এই পলাশির যুদ্ধে কবি নবীনচন্দ্র রানি ভবানীকে দেশপ্রেমিক হিসেবে দেখিয়ে তাঁর মুখ দিয়ে অমোঘ মন্ত্রের মতো উচচারণ করিয়েছিলেন

জ্ঞানহীন নারী আমি, তবু মহারাজ।
দেখিতেছি দিব্যচক্ষে সিরাজদ্দৌলায়
করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবে না ইংরাজ।
বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য পিপাসায়।

একথার মধ্যে দিয়ে নবীনচন্দ্র যেমন এদেশে ইংরেজ আগমনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কথা নির্দ্ধিধায় বলিয়েছেন, তেমনি তিনি হিন্দু - মুসলমানের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য অনুসারিতায় বলিয়েছেন

জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্ন জাতি; তবু ভেদ আকাশ পাতাল।
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধ পঞ্চশতবর্ষ। এই দীর্ঘকাল
একত্র বসতি হেতু, হয়ে বিদূরিত
জেতা জিত বিষভাব, আর্য্যসুতযনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত;
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি - ধর্ম্মের কারণে।

এরপর কবি নবীনচন্দ্র দেশদ্রোহী হিসেবে চিহিত করে বলেছেন 'ধিক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র! ধিক উমিচাঁদ', 'রে পাপিষ্ঠ রাজা রায়

দুর্ল্লভ দুর্বল'। মোহনলালেল মুখ দিয়ে মিরজাফরকে ধিক্কার দিয়েছেন। --- নবীনচন্দ্র এতদূর এগিয়েও কিন্তু সিরাজকে সর াসরি সমর্থন করেন নি, ইংরেজের শেখানো ইতিহাসের আলোকেই তিনি সিরাজকে সমর্থন করেন নি, ইংরেজের শেখানো ইতিহাসের আলোকেই তিনিসিরাজকে দেখেছেন। তাঁর চোখে রবার্ট ক্লাইভ বীরপুষ রূপে চিহ্নিত হয়েছেন, ইংরেজ 'জয়' - কে তিনি স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছেন। নবীনচন্দ্রের রূপে চিহ্নিত হয়েছেন, ইংরেজের 'জয়' - কে তিনি স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছেন। নবীনচন্দ্রের মানসিক দ্বন্দ্বের প্রতিফল ঘটেছে তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যগ্রন্থে। বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ কবি নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই সমসময়ের দেশ - কাল - সমাজ সম্পর্কে যথাযথ অবহিত ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনাধীন দেশে বিদেশি সরকারের পদস্থ কর্মচারি হিসেবে সরকারি ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গতি করতে গিয়ে তাঁরা অনেক সময়ই মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে থাকবেন, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর নিবিষ্ট পাঠে বঙ্কিমের দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ মানসিকত ার পরিচয় মেলে। কিন্তু এই দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধতা শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের অবসান - চিন্তায় যুক্ত হতে পারে নি, বরং রাজ ানুগত্যের মধ্যেই স্বস্তির অন্বেষণ করেছিল। নবীনচন্দ্র সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। 'পলাশীর যুদ্ধ' - এ নবীনচন্দ্র সাহসের সঙ্গে অনেক কথা বলেও শেষ পর্যন্ত রাজানুগত্যের প্রতি প্রণত থেকেছেন। এই যে মানসিক দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধতা তা সমসময়ের বুদ্ধিমার্গীয় ভাব - চেতনার দ্বন্দ্বের সঙ্গেই সমন্বিত।

'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশিত হওয়ার তিরিশ বছর পর গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক প্রকাশিত হওয়ার পর নবীনচন্দ্র এই নাটকের এক কপি সংগ্রহ করে পড়ে এবং পড়ার পর গিরিশচন্দ্রকে ফেব্রয়ারি ২৫,১৯০৬ তারিখে প্রসঙ্গত লিখেছিলেন

তুমি 'সিরাজদ্দৌলা' লিখিয়াছ শুনিয়া তাহার একখানি আনাইয়া এইমাত্র পড়া শেষ করিয়াছি। তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। আমি যখন 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখি তখন সিরাজের শত্রুচিহ্নিত অ ালেখ্যই আম াদের একমাত্র অবলম্বন ছিল।...

কিন্তু এই 'সিরাজের শত্রুচিহ্নিত আলেখ্য' ক্রমশ প্রাকুল হতে থাকে উনিশ শতকের সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই। ১২৮৩ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় 'আধুনিক ভারত' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধে যা লেখা হয়েছিল, তার কিয়দংশ উদ্ধার করছি

পলাশী যুদ্ধের দিন হইতে ভারতের অদৃষ্টচক্রের গতি পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমান রাজাদিগের অত্যাচার দুর্বিসহ হওয়ায় কতিপয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু চক্রান্ত করিয়া বঙ্গের রাজত্ব মুসলামনের মস্তক হইতে তুলিয়া ইংরাজ বণিকের মস্তকে অর্পণ করেন। ...সকলেই জানেন কেমন করিয়া ধূর্ত বণিক সূচ্যগ্র পরিমাণে প্রবেশলাভ করিয়া এক্ষণে বিশাল শাল রূপে পরিণত হইয়াছে।

লক্ষণীয়, এই প্রবন্ধে চক্রান্তকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল 'কতিপয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু' কে। এই লেখায় মহারাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র

ইংরাজদিগকে উপলক্ষ করিয়া মুসলমানভ্রাতৃগণের চরণে যে শৃঙ্খল পরাইতে গেলেন, ধূর্ত ইংরাজদিগের বুদ্ধি কৌশলে আ পনারা সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন।... আজ তাঁহাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমরা সকলেই ভোগ করিতেছি।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিকা* সম্পর্কে লিখেছেন

* প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের 'ক্ষিতীশ - বংশাবলী চরিত' এবং 'আত্মজীবন চরিত' শীর্ষক গ্রন্থদুটির যথাক্রমে চতুর্দশ অধায় এবং 'পলাসী ক্ষেত্র' ও 'পলাসী যুদ্ধ সম্বন্ধে দুই - একটি কথা' শীর্ষক উপাধ্যায় দুটি।

...রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই রাজবিপ্লবের প্রবর্ত্তক, মন্ত্রী ও প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি এ বিষয় (অর্থাৎ সিরাজকে উৎখাত করে ব্রিটিশি শাসন প্রবর্তনের) বিশেষ যত্নবান ও উদ্যোগী ছিলেন বলিয়া, এ প্রদেশস্থ প্রাচীন লোকেরা তাঁহাকে নেমক - হারাম ক হিত,...

এসব তথ্য সমসময়ে একদিকে যেমন ইংরেজের প্রচলিত প্রচারধর্মিতাকে আঘাত করছিল, তেমনি তার নাট্যকার গিরিশচন্দ্র

ঘোষের ‘সিরাজদ্দৌলা’ রচনা প্রেক্ষাপটও তৈরি করছিল নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায়।

।। তিন ।।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘সিরাজদ্দৌলা’র মতো নাটক লেখার বিষয়টি নিঃসন্দেহে তাঁর প্রথাগত কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার বাস্তব ঘটনার সঙ্গেই সমন্বিত। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ ও এপ্রিল মাসে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন যথাক্রমে ‘হরগৌরী’ ও ‘বলিদান’। আর, এর মাত্র পাঁচ মাসের মাথায় ঐতিহাসিক ঘটনার প্রকৃত তথ্যের নিরিখে গিরিশচন্দ্র প্রকাশ করেন তাঁর নাটক ‘সিরাজদ্দৌলা’।

সিরাজের ব্যাপারে ব্রিটিশ শাসকদের অপপ্রচারধর্মিতা যে যথেষ্ট শক্ত ভিত্তিতে থেকে গিয়েছিল, তা বোধহয় গিরিশচন্দ্রের কাছে অধরা ছিল না। সিরাজ, সিরাজের বিদ্ধে এবং এ ব্যাপারে ইংরেজদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানার আগ্রহ তাঁর থেকেই গিয়েছিল।

এদেশের হিন্দু - মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে জন্ম দিয়ে, লালিত এবং পরিবর্দ্ধিত করার মধ্যে দিয়ে যে একটা চক্রান্ত হাসিল করার চেষ্টা সক্রিয় অনুশীলনে থেকে গিয়েছিল, তা সম্ভবত তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে ‘জন্মভূমি’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘পলাশী’ শীর্ষক প্রবন্ধে বিহারীলাল সরকার ব্রিটিশ - প্রচারিত সিরাজের ওপর কলঙ্ক আরোপের পরিকল্পনা থেকে অন্ধকূপহত্যার কল্পিত কাহিনির ভিত্তিহীনতা প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছিলেন। এরপর ১৮৯৭ খিস্টাব্দের ১জুলাই নিখিলনাথ রায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘মুর্শিদাবাদ কাহিনী’ প্রকাশিত হয়। এরপর জানুআরি ২১, ১৮৯৮ তারিখে প্রকাশিত হয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র ‘সিরাজদ্দৌলা’।

গিরিশচন্দ্র এইসব রচনার নিবিষ্ট পাঠ নিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটক রচনার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। ‘সিরাজদ্দৌলা’- র ভূমিকাংশে গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন

বিদেশী ইতিহাসের সিরাজ চরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে! সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধিগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খন্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শন করেন।

গিরিশচন্দ্রকে ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটক লেখার ব্যাপারে প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন ‘সাহিত্য’ পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সুরেশচন্দ্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং জলধর সেনের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সুহৃদ ছিলেন। গিরিশচন্দের ‘ভূমিকা’ পাঠে এ তথ্যও জানা যায়যে এই নাটকটি ‘সমাপ্ত’ হওযার পর ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় নাটকটি ‘আদ্যোপান্ত শ্রবণে পরম প্রীতি প্রকাশ’ করেছিলেন। এই নাটকের ব্যাপারে জলধর সেনের প্রতিও গিরিশচন্দ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। ‘সিরাজদ্দৌলা’ লেখার জন্য অক্ষয়কুমার - নিখিলনাথ -বিহারীলাল - কালীপ্রসন্ন প্রমুখের পরিশ্রমী রচনা পাঠের পাশাপাশি গিরিশচন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটি - তে সিরাজদ্দৌলা সংক্রান্ত ‘যতপ্রকার ইংরেজি পুস্তক’ ছিল তা তিনি লাইব্রেরিয়ান যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় সংগ্রহ করে পড়েছিলেন। স্বভাবতই ‘সিরাজদ্দৌলা’ যে গিরিশচন্দ্রের যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য, সচেতন এবং উদ্দেশ্যমূলক রচনা, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

গিরিশচন্দ্রের ‘সিরাজদ্দৌলা’ এক ঐতিহাসিক সময় - সন্ধিক্ষণে এক ঐতিহাসিক নাট্যকর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ সময়ে এই নাটকটির আবির্ভাব ঘটেছিল। আগস্ট ৭, ১৯০৫ তারিখে বঙ্গবিভাগ কার্যকরী করার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিলাতি বর্জনে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয় এবং এই সুত্রেই স্বদেশি আন্দোলনের সুত্রপাত হয়। পৃথ্বীশচন্দ্র রায় রচিত ‘লাইফ অ্যান্ডটাইমস অব সি. আর দাশ’গ্রন্থে এ সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে তার কিয়দংশ উদ্ধার করছি

Immediately after the official announcement of the partition scheme on August 7th., the Hono’ble Maharaja Sir Mannindra Chandra Nandi of Kashimbazar presiding over an enormous gathering of the citizens of Calcutta, inaugurated the movement for the boycott of all foreign goods as a measure of retaliation. This movement came to be known in later days as the great Swadeshi movement.

এই সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে আশুতোষ চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল, নরেন্দ্রনাথ সেন

প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আর এই ঘটনার ঠিক একমাস দুই দিনের মাথায় অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ৯, ১৯০৫ তারিখে (২৪ভাদ্র ১৩১২ বঙ্গাব্দ) কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' প্রথম অভিনীত হয়।

এই নাটকে গিরিশচন্দ্র একদিকে যেমন ব্রিটিশের শেখানো ইতিহাসের শিক্ষাকে পরিহার করেছেন, তেমনি অন্যদিকে সম্প্রদায় নির্বিশেষে হিন্দু - মুসলমানের দেশপ্রেম এবং দেশদ্রোহিতার তথ্যকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছন। এই নাটকে একদিকে দেখা যায় সিরাজের দেশপ্রেম ও দেশরক্ষার সংগ্রামে তাঁর পক্ষে হিন্দু - মুসলমানদের - সম্প্রদায় নির্বিশেষে যুক্ত ঐক্য, তেমনি বিপরীতে বিশ্বাসঘাতক শিবিরেও বেইমান হিন্দু ও মুসলমানদের যুক্ত ঐক্য। সম্প্রদায় গতভাবে হিন্দু - মুসলমানদের ভেদ - বিভেদকে বড়ো করে দেখিয়ে মুসলমান - বিরোধী হিন্দুত্বের মন--- মনস্কতার অশুভ প্রবণতার মোকাবিলা এভাবেই করেছিলেন। তাঁর কাছে দেশপ্রেমিক ও বিশ্বাসঘাতকদের কোনও সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য গ্রহণযোগ্য হয়নি।

এদেশে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী, বিশেষ করে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে পরবর্তীতে হিন্দু - মুসলমানের মধ্যেকার চিরাচরিত সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে ভেঙে দ্বিধাবিভক্ত করে নিজেদের কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থতার ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বিশ শতকের গোড়ার দিকে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সম্পর্ককে বিষিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় তারা খানিকটা সাফল্যও পেয়েছিল। আর এ কাজে তাদের সহযোগিতা যুগিয়েছিলেন আমাদের দেশের কংগ্রেস নেতৃত্বের একটা হিন্দুত্ববাদী অংশ। বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরম গানের পৌত্তলিকতা একদিকে যেমনহিন্দুত্ববাদী জাতীয়তবাদের পক্ষে উল্লাসের কারণ হয়েছিল, তেমনই তা খুব স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। স্বদেশি আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে যখন হিন্দু দেবতা 'দুর্গা' 'কালী' প্রভৃতি এবং ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে 'গীতা' -র প্রসঙ্গ বারবার সামনে আসতে থাকল, তখন তা বিপরীতক্রমে মুসলিম ভাবাবেগে আঘাত করে তাদের দূরে সরিয়ে দিতে থাকে। আর এর সুযোগ খুব স্বাভাবিকভাবে নিয়েছিল ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী। ডিসেম্বর ৩,১৯০৩ তারিখে 'ক্যালকাটা গেজেটে' বঙ্গবিভাগের সরকারি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। এই সূত্রে লর্ড কার্জন নিজে ঢাকায় গিয়ে মুসলিমদের প্রলোভন দেখিয়ে বঙ্গবিভাগের পক্ষে তাদের সমর্থন আদায়েরপ্রয়াস পেয়েছিলেন । এবংএ ব্যাপারে তিনি কিছুটা সাফল্যও পেয়েছিলেন। স্বভাবতই এহেন পরিস্থিতিতে গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক রচনা ও মিনার্ভা থিয়েটারে ৯ সেপ্টেম্বর (১৯০৫) তারিখে তার অভিনয় করানো অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ। স্বদেশি আন্দোলন যে গিরিশচন্দ্রকে রীতিমতো প্রভাবিত করেছিল তা এই অগ্নিগর্ভ সময়ে তাঁর এই নাটকরচনার মধ্যে প্রকাশ পায়। এ সময়ে তাঁর রচিত আরও কিছু নাটক ও গান ও তাঁর স্বদেশি মানসিকতার প্রমাণ দেয়।

সিরাজকে গিরিশচন্দ্র হাজির করেছেন জাতীয় নেতা হিসেবে। হিন্দু জাতীয়তাবাদের ফলশ্রুতিতে নায়ক হিসেবে এর আগে বা সমসময়ের উপস্থাপিত করা হয়েছিল রানা প্রতাপ প্রতাপাদিত্য, শিবাজী প্রমুখকে। এইসব জাতীয় নেতারা সাধারণ, তাঁদের সংগ্রাম নিবন্ধ রেখেছিলেন 'সাম্রাজ্যবাদী' শক্তিরূপে চিহ্নিত মুসলমান বাদশাহদের বিদ্ধেই। স্বভাবতই এক্ষেত্রে জাতীয় চিন্তা ছিল প্রত্যক্ষত খন্ডও অপ্রত্যক্ষত হিন্দু - জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সমন্বিত। কিন্তু গিরিশচন্দ্র সিরাজকে জাতীয় নেতা হিসেবে চিহ্নিত করে বিদেশি শক্তির দেশাধিকারের চক্রান্তের বিদ্ধে মরণপন ও আপসহীন লড়াইয়ে নিয়ে এসে এক ঐতিহাসিক দায়িত্বমনস্কতার পরিচয় রেখেছেন। এ ঘটনা একদিকে যেমন প্রচলিত মিথ্যা প্রতারণার ধারাকে নির্দিষ্টভাবে আঘাত করেছে, তেমনি তা একইসঙ্গে প্রকৃত জাতীয়তাবাদের প্রটিকে জোরের সঙ্গে সামনে এনে হাজির করেছে। জাতীয় নেতা হিসেবে সিরাজের উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য

ওহে হিন্দু মুসলমান
বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার
স্বার্থপর চাহে মাত্র রাজ্য - অধিকার।
কিম্বা
বিদেশী আপনার হয়, ইতিহাস পৃষ্ঠায়
এমন দৃষ্টান্ত নাই।
কিম্বা
হে অমাত্যগণ, আমায় শত্রু বিবেচনা করবেন না।...
ফিরিঙ্গি বাঙালির দুশমন।

এখানে সিরাজ প্রজাবৎসল। তাঁর দৃষ্টিতে--
প্রজার মঙ্গলসাধন ভার আমার উপর, নবাব বংশের মর্যাদা রক্ষার
ভার আমার উপর, বাঙলার ভবিষ্যৎ শান্তিস্থাপনের ভার আমার
উপর, বিদেশী দস্যুর হস্ত হতে প্রজারক্ষা করার ভার আমার উপর...।
এই নাটকে সিরাজ একদিকে যেমন প্রজাবৎল, দেশপ্রেমিক, মদিরাসক্ত নন, তেমনি অন্যদিকে প্রেমিক, আত্মসমালোচনায় অকাতর। আলিবার্দির মৃত্যুর পর থেকে নিজেকে শুধরে নিয়েছেন সিরাজ। তাঁর স্বীকারোক্তি
স্বেচ্ছাচারে চলিত জীবন
হিতাহিত ছিল না বিচার
মদ্যপানে করিয়াছি, শত শত দুর্নীত ব্যাভার।
কিন্তু কহি স্বরূপ বচন,
বসি বৃদ্ধ নবাবের মরণ শয্যায়,
শেষ বাক্যে তাঁর---
জন্মিয়াছে ধারণা আমার
রাজকার্য নহে স্বেচ্ছাচার
এর ফলশ্রুতিতে তাঁর মনে হয়েছে
নবাব রাজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে;
প্রজার মঙ্গলকার্য্য সতত সাধন,
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।
সিরাজ মদিরাসক্তি ত্যাগ করেছেন। এখন আর তিনি মদ স্পর্শ করে না।* করিমচাচার উক্তিতে প্রকাশ পায় এ তথ্য 'আলিবর্দী সিংহাসনটা দিয়ে গেলেন, আর দিব্যি দিয়ে মদ ছড়িয়ে, নবাবী রোকটি কেড়ে নিলেন।' অতীতের কু - অভ্যাস যেমন ত্যাগ করে নিজেকেপরিবর্তিত করেছেন সিরাজ, তেমনই অতীতের কিছু অন্যায় কাজের জন্য তিনি অনুতপ্তও 'দিল্লীর বারবিলাসিনী ফৈজির প্রাণ বিনাশ করেছিলাম, না জানি সে কত যন্ত্রণাই সহ্য করেছে-- এখন মনে হচ্ছে বিনাদোষে তার প্রাণবধ হয়েছে।' নিজে ছুরিকাহত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আগে বলেছেন 'হোসেনকুলি, তুমি কি তৃপ্ত?'
আলিবর্দি - বেগমের কথা ও পরামর্শকে সিরাজ এখন যথাযথ গুত্ব দেন। চক্রান্তের মধ্যে আবর্তিত হয়েও, সংকটকালে নিজ সিদ্ধান্ত আলিবর্দি -বেগমের নির্দেশে পরিবর্তিত করেছেন। চক্রান্তকারীদের চিহ্নিত করেও তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন চক্রান্ত ভুলে সহযোগিতা করার জন্য। মিরজাফরের নেতৃত্বে বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত চিত্র পরিস্কার হওয়ার পরও সিরাজ মিরজাফরকে বলেছেন
আমি আপনার মীরনের তুল্য, আমার বধসাধন করবেন না।...আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই -- শয়নে ক্লাইভের ভীষন মূর্ত্তি আমার সম্মুখে বিরাজিত। বিদেশী বনিকের দ্বারা আপনার পূজ্য প্রভুর পালিত সন্তানের অপমান না হয়, বিদেশী রণভেরী আর না বাঙালায় শব্দিত হয়...! আপনি রাজ্যের ভরসা, আপনি সাহস দিন, আমি বড়ই কাতর হয়েছি।
দেশের স্বাধীনতা রক্ষার স্বার্থে সিরাজ বারবার মসনদ ছেড়ে সরে আসতে রাজি হয়েছেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে ধবণিত হয়েছে 'মহাশয়,আপনাদের সকলের যদি অভিপ্রেত হয় যে আমি অযোগ্য, যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করে বাঙালির গদীতে স্থাপন কন।' তাঁর ইচ্ছা 'ইংরাজ পরাজিত হোক, বাঙালার গৌরব রক্ষিত হোক ... এ ছার রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই।' অত্যন্ত আধুনিককালের রাজনীতি -সচেতন নায়কের মতোই সিরাজের মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়েছে।
যদি কখনো সুদিন হয়, যদি কখনো জন্মভূমি অনুরাগে হিন্দু - মুসলমান ধর্ম্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ করে পরস্পর পরস্পরের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চ - স্বার্থে চালিত হয়ে সাধারণের মঙ্গল যদি আপন মঙ্গলের সহিত বিজড়িত জ্ঞান করে যদি ঈর্ষা, বিদ্বেষ,নীচ প্রবৃত্তি দলিল করে স্বদেশবাসীর অপমানে আপনার অপমান জ্ঞান করে, যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় খড়্গহস্ত হয় -- এই দুর্দম ফিরিঙ্গিদমন তখন সম্ভব; নতুবা অভাগিনী বঙ্গমাতার পরাধীনতা অনিবার্য! মীরমদন, আক্ষেপ ত্যাগ করো। জেনো, বাঙলার সকলেই মীরমদন নয়।

*অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থে লিখেছেন সিরাজ সিংহাসনে বসার আগেই পানদোষ পরিত্যাগ' করেছিলেন। Beveridge-ও লিখেছেন He used to drink, but he gave up his habit in accordance with a promise which he made to Aliverdi on his death – bed. (দ্রষ্টব্য), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'সিরাজদ্দৌলা'। গুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ডসন্স, কলকাতা। নবম সংস্করণ। পৃ - ৩৫৯-৬০)

সিরাজের বিশ্বস্ত সেনাপতি হিসাবে মিরমদন, মোহনলাল তাঁদের সেনাবাহিনী নিয়ে বীরের মতো লড়াই করেছে। যুদ্ধে মারাত্মকরূপে আহত এবং - মুমূর্ষু মিরমদন তার শেষ সময়ে সিরাজকে বলেছে
বড় সাধ ছিল ক্লাইভের মস্তক চরণে উপহার দেবো।...জনাব, সাবধান---বিশ্বাসঘাতকদের আর বিশ্বাস করবেন না, সকলেই শত্রু। হস্তীপৃষ্ঠে স্বয়ং যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হোন। বাঙলার সেনা রাজভক্ত, জনাবকে রণস্থলে দেখে, বিশ্বাসঘাতকদের বাক্য অবহেলন করে, সকলে প্রাণপনে ইংরেজকে আক্রমন করবে।
রনস্থলে মোহনলাল সৈন্যদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান রাখেন
এসো -- এসো, অগ্রসর হও, রণজয়ের আর বিলম্ব নাই। যদিচ মীরমদন পতিত, তোমরা জনে জনে তাঁর অনুসরণ করো, জনে জনে মীরমদন হও, স্বদেশের নিমিত্ত প্রাণ দিতে কাতর হয়ো না, মীরমদনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করো।
কিন্তু চক্রান্তের জাল এতই ঘননিবদ্ধ যে মিরমদনের অনুরোধে যেমন সিরাজের রণক্ষেত্রে যাওয়া হয়ে ওঠে না, তেমনই মোহনলালের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া মিললেও চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়ে তাঁকে রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে হয়, অন্য দিকে গভীর চক্রান্তের জাল বুনে চলেছে মিরজাফর, রায়দুর্লভ, জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, জোহরা, ঘসেটি বেগম। ইংরেজ শিবিরের সঙ্গে গোপন চুক্তি। সিরাজকে উৎখাত করতেই হবে। এভাবেই বিদেশি ইংরেজদের কাছে বাঙলার স্বাধীনতাকে ভেট দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল মিরজাফর - জগৎ শেঠ প্রমুখ বেইমান, বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীর দল।
এ নাটকে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতার ক্ষেত্রেও গিরিশচন্দ্র যথেষ্ট সচেতনতা দেখিয়েছেন। চক্রান্তকারীদের মধ্যে যেমন হিন্দু - মুসলমান নির্বিশেষে দেশদ্রোহী - বিশ্বাসঘাতকরা সমবেত হয়েছে, তেমনই অন্যদিকে দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজের পাশে সমবেত হয়েচে হিন্দু - মুসলমান নির্বিশেষে বিশ্বস্ত দেশপ্রেমিক সৈন্যদল, যাদের সেনাপতিত্বে রয়েছেন একইসঙ্গে মিরমদনের মতো মুসলমান আর মোহনলালের মতো হিন্দু। করিমচাচা চরিত্রসৃষ্টি খুব সম্ভব হিন্দু - মুসলমানের সম্প্রীতির জীবন্ত প্রতীক হিসেবে। করিমচাচার নাম কমলাকান্ত, যে কিনা হিন্দু। অথচ মুসলমানের পোশাক - আশাক, আচার - ব্যবহার গ্রহণকারী এই করিমচাচা তথা কমলাকান্ত হিন্দু মুসলিম ধর্ম -সমন্বয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছেন। প্রকাশ্যে না হলেও তিনি দেশ - প্রেমিক এবং নাটকের শেষের দিকে তিনি ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। সিরাজকে বাঁচাবার জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত নিজের পোশাক সিরাজের সঙ্গে বদল করেছেন। অন্যদিকে 'মুসলমান' নবাব সিরাজের বিদ্ধে মুসলমান ফকির দানসা ধর্মীয় জেহাদ তুলেছে। নবাবের বিদ্ধে কুৎসা রচনার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে সে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াতে চেয়েছে 'মুই ফকির রোজার দিন ছেপ গিলছিলাম,, তাই হুদু'র ভূতটা ঘাড়ে চাপছিলো।'
গিরিশচন্দ্রের এই নাটকের ত্রুটির বিষয়াবলীও উপেক্ষনীয় নয়। সরাসরি ইংরেজের নাম করে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ধর্মান্ধতারঊর্ধে উঠে ইংরেজের বিদ্ধে সচেতনভাবে সিরাজকে জাতীয় নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার যে প্রয়াস গিরিশচন্দ্র পেয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। ইংরেজের বিদ্ধে এহেন জাতীয়তাবাদের প্রচার করতে গিয়েও কিন্তু মিরজাফর - তথা মিরনের হাত থেকে সিরাজ - পত্নী লুৎফউন্নিসাকে মুক্ত করার পর কৃতজ্ঞা লুৎফাকে দিয়ে গিরিশচন্দ্র বলিয়েছেন
বিবি -- বিবি -- তুমি ঈশ্বর -- প্রেরিতা, আমার রক্ষার জন্য তোমায় ঈশ্বর প্রেরণ করেছেন! এখন বুঝলেম, কি করে তোমরা জয়লাভ করেছ। ঈশ্বর তোমাদের সহায়।
এছাড়া চরিত্র, সংলাপ প্রভৃতি নিয়ে সমালোচনার জায়গাও আছে। তবে সেই অ্যাকাডেমিক আলোচনা আমাদের অন্বিষ্ঠ নয়। প্রথাগত ধ্যান - ধারনার বিপরীতে, প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধানের নিরিখে, ব্রিটিশ শাসকবর্গের 'ভাগ করে শাসন করার' সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির বিদ্ধতায়, প্রচলিত জাতীয় নেতা চিত্রায়নের ক্ষেত্রে 'হিন্দু' মন - মনস্কতার সংস্কারের উর্ধ্বে উঠে

যে অসাধারণ রাজনীতি - সচেতনতা -- ঋদ্ধ নৈপুন্যের পরিচয় গিরিশচন্দ্র এই নাটকে রেখেছেন--- তাকে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের মুমূর্ষু ও সংগ্রামী মানুষের স্বার্থে এক ঐতিহাসিক কর্তব্যপালন হিসেবেই দেখতে হবে। 'সিরাজদ্দৌলা'র গুত্ব এখানেই। আর এ জন্যই এ নাটক সমসময়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল পরাধীন ভারতের মুক্তিকামী মানুষজনের কাছে। আর অন্যদিকে এই নাটকের বক্তব্য এবং জনপ্রিয়তা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসক-শ্রেণীকে।

পলাশির ঘটনায় দেশদ্রোহীরা উল্লসিত হলেও, ব্রিটিশ লুটেরারা খুশি হলেও, দেশের সাধারণ মানুষের মনের অভ্যন্তরে রয়ে গিয়েছিল যন্ত্রণা। পল্লীকবির আর্ত বেদনাভরা গানে ধরা পড়েছিল এর স্পন্দন

কি হলোরে জান,
পলাশী ময়দানে নবাব হারালো পরাণ।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে রয়ে,
একলা মীরমদন বল কত নেবে সয়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্ত্তি গায়,
হাঁটু গেড়ে, মারছে তীর মীরমদনের গায়ে

কি হলোরে জান,
পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানী নিশান।
ফুলবাগে ম'ল নবাব খোসবাগে মাটি
চাঁদোয়া টাঙায়ে কাঁদে মোহনলালের বেটি।

এই যে যন্ত্রণা এখানে মূর্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তা পরবর্তীতে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের আশর্চ্য জনপ্রিয়তার ভিত্তি রচনা করেছিল। অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে 'সিরাজদ্দৌলা' অভিনয়ের প্রথম রাত্রির টিকিট বিত্রি থেকে এসেছিল ৮২১ টাকা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রজনীর টিকিট বিত্রি থেকে এসেছিল যথাত্রমে ৭৯৮ ও ৭৭৩ টাকা। একটানা ২৪ রাত্রি সিরাজদ্দৌলা অভিনয়ের টিকিট বিত্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থাঙ্কের গড় পরিমাণ ছিল ৭০০ টাকা। সমসময়ে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের 'বেশ কিছুটা বড় অংশ' হয়ে পড়েছিল এই নাটকটি। কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে কলকাতায় এসে সেসময় বালগঙ্গাধর তিলক খাপর্দে প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা'র অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং নাটকটির খুব সুখ্যাতি করেছিলেন। অভিনয় দেখার জন্য তিলকের পদার্পনের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সমস্ত দর্শক সমস্বরে 'বন্দেমাতরম' ধবনি দিয়েছিলেন। ফেব্রয়ারি ৩, ১৯০৬ তারিখে 'বেঙ্গল' পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে সাহিত্য ও নাটকীয় গুণবিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে বলতেই হয় 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটি আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গনে উঁচু স্থান করে নিয়েছে। ফেব্রয়ারি ১৭,১৯০৬ তারিখের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় সংবাদসুত্রে জানা যায় যে এই নাটকটি পাঁচ মাস ধরে অভিনীত হয়েছে এবং তার সাফল্যের দুর্বার গতি অব্যাহত থেকেছে। করিমচাচার ভূমিকায় স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ও দর্শক - বন্দিত হয়েছিল।

ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' সম্পর্কে বলেছিলেন যে নাট্যকার সিরাজকে রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে জনসমক্ষে হাজির করেছেন, তিনি 'ইতিহাসের মর্যাদা' রক্ষা করেছেন। অক্ষয়কুমারকে পড়ার জন্য 'সিরাজদ্দৌলা'র কপি পাঠিয়েছিলেন কাঙাল হরিনাথের ভাবশিষ্য জলধর সেন স্বয়ং। ফেব্রুয়ারি ৮,১৯০৬ তারিখে এক চিঠিতে একথার উল্লেখ করে অক্ষয়কুমার গিরিশচন্দ্রকে লিখেছিলেন

ইতিহাস যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, আপনি তাহাকেই প্রত্যক্ষবৎ ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।...ছোটখাট বিষ য় আমি ধরি না; মোটের উপর আপনি ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়া নাটকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহাই আ পনার রচনা প্রতিভার প্রচুর আত্মপ্রসাদ।

গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটককে অক্ষয়কুমার 'ইতিহাসের মর্যদা রক্ষা'র সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে শংসাপত্র

দিয়েছিলেন। দেশপ্রেমিক সিরাজ বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহীদের চক্রান্তের বিদ্ধে আপসহীন লড়াই করে দেশকে ইংরেজদের করতলগত হওয়ার সম্ভাবনাকে খতে চেয়েছিলেন। নিজের জীবন দিয়ে তিনি দেশপ্রেমের প্রমাণ রেখে গিয়েছেন।*
'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের বিপুল জনপ্রিয়তা, এর চাহিদা, জাতীয় আন্দোলনের গতিধারায় এর আবেদন, সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বিষ্টভাব প্রচার - প্রচারণার বিদ্ধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি রক্ষার এবং বিদেশি শক্তির বিদ্ধে জাতীয় সংগ্রামী মানসিকতা গঠনে এই নাটকের সক্রিয় উপাদান যোগানোর বাস্তব তথ্যে ভীত হয়ে ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত জানুয়ারি ৮,১৯১১ তারিখে এই 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করে দেয়।*

।। পাঁচ ।।

গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা'-র আবেদন যে শুধুমাত্র জাতীয় চেতনার স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, সাম্প্রদায়িকতা - বিরোধী এবং ব্রিটিশবিরোধী স্বদেশিকতার যে আবেদনময়তা এই নাটকে উজ্জ্বল অবস্থান নিয়ে ছিল, তা একদিকে যেমন স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দর্শকবন্দিত হয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে তা সমসময়ের নাট্যকারদেরও এই প্রবণতার সাযুজ্যে নতুন নাটক লিখতে প্রাণিত করেছিল। এপ্রসঙ্গে আমরা শুধুমাত্র দু'জন নাট্যকারের কথা উল্লেখ করছি। এঁদের একজন হলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং অন্যজন শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী।
১৩১৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ 'সিরাজদ্দৌলা' প্রথম অভিনয়ের পরে মাত্র এক বছরের সময়সীমায় ক্ষীরোদপ্রসাদ লেখেন 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত'। গিরিশচন্দ্রের চিন্তাচেতনার ছায়াপাত এখানে স্পষ্ট। এই নাটকের মুখবন্ধে ক্ষীরোদপ্রসাদ উল্লেখ করেছেন যে এই নাটক রচনায় তিনি সাহায্য নিয়েছেন বিহারীলাল সরকার, নিখিলনাথ রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় -র যথাক্রমে 'ইংরেজদের জয়' 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী', ও 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থত্রয় থেকে। উল্লেখ থাকতে পারে যে এই একই কথা গিরিশচন্দ্রও তাঁর নাটকের মুখবন্ধে লিখেছিলেন। ক্ষীরোপ্রসাদের এই নাটকে মোহনলাল তার কন্যা মতিবিবিকে বলেছে
যেভাবে ফৌজ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলুম, আর আধঘন্টা যদি এইভাবে এগিয়ে যেতে পারতুম, তাহলে বুঝি পলাশীর যুদ্ধ আর একরকম ইতিহাসে চিত্রিত হতো।...মুর্শিদাবাদের মসনদে ক্লাইভের গাধাকে বসতে হতোনা। বড়ই ভুল করে ফেললুম মা, বড়ই ভুল করে ফেললুম। ...প্রাণের বন্ধু মীরমদন যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে তার সুমুখের শত্রু পল্‌টন ছারখার করে প্রাণ দিলেন, আমি তার মৃত্যুর প্রতিশোধও নিলুম না!

*Malleson's Decisive Battles of India গ্রন্থে নির্দ্বিধায় লেখা হয়েছে Whatever may have been his faults, Siraju'd had neither betrayed his master nor sold his country…no unbiased English…can deny that the name of Siraju'daulah stands higher in the scale of honour than does the name of cline. He was the only one of the principal actors in that tragic drama who did not attempt to deceive! নিখিলনাথ রায় তাঁর 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' - তে একথা উদ্ধৃত করেছেন।

অন্যদিকে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' প্রকাশের পরের বছর, শ্রীমতি মৃণালিনী দেবী লেখেন ৭৮ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থিকা, নাম 'পলাশীর লীলা'। ক্ষীতীশচন্দ্র সেনকে উৎসর্গ করে এই লেখিকা যা লিখেছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে
যে বিদেশ - বাণিজ্যের অসমতা দূর করিতে যাইয়া তুমি নিরস্ত্র অসহায় বাঙালী পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত বোধ করিতেছ, দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে আষাঢ়ের ঠিক এমনি দিনে, একজন বিংশতি বর্ষীয় বাঙালী মুসলমান যুবক, রণপণ্ডিত, কর্তব্যপরায়ণ, প্রজাপালক, ধর্মভী বাঙালা - বিহার - উড়িষ্যার প্রবল প্রতাপান্বিত অধিপতি ষষ্টি সহস্র পদাতিক, অষ্টাদশ সহস্র আরোহী ও পঞ্চাশ উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র সহায়ে সে বাণিজ্যস্রোতের গতিরোধ করিতে যাইয়া লীলা - আবর্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারই পুণ্যকীর্তির ছায়ামাত্র এ দুর্বল লেখনী তোমার সম্মুখে প্রতিভাত করিল। বিচার করিয়া দেখ, কে স্মৃতিস্থাপনের অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি, পলাশী - বিজেতা ক্লাইভ, না লীলাচত্রে অধ পতিত দেশহিতৈষী সিরাজদ্দৌলা।
গিরিশচন্দ্রের মতো এই লেখিকাও শিরাজকে 'কর্তব্যপরায়ণ' 'দেশহিতৈষী,' 'প্রজাপালক' বলে চিহিত করেছেন এবং লিখেছেন 'আর যে দোষে দোষী হউক না কেন, সিরাজদ্দৌলা রাজদ্রোহী বা দেশদ্রোহী ছিলেন না।'

গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা'র পরবর্তীতে এই সব সৃষ্টিকর্মে যে ব্রিটিশের শেখানো ইতিহাসের বাইরে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে, তা ইতিহাসগত কারণেই গুত্বপূর্ণ।
এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা' রচনার প্রথম পর্যায়ে প্রথাগতভাবে কিছু ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশীয়দের লেখা বইপত্রের ওপরই সম্পূর্ণতই নির্ভরশীল ছিলেন। বাঙালায় লেখা ইতিহাস স ম্পর্কে তাঁর প্রকৃতপক্ষে কোনও 'শ্রদ্ধা ছিল না।' তাঁর ধারণা ছিল বাঙালিরা কেউ পরিশ্রম বা সতর্কতা অবলম্বন' করে বড়ো একটা ইতিহাস লেখে না। অক্ষয়কুমারের 'সিরাজদ্দৌলা' সম্পর্কেও প্রথম পর্যায়ে তাঁর খুব একটা আগ্রহ ছিল না। অথচ পরবর্তীতে এই গ্রন্থটির নিবিষ্ট পাঠ -ই তাঁর মত বদলে দিয়েছিল। অক্ষয়কুমারের 'সিরাজদ্দৌলা' পড়ে তিনি যে শুধুমাত্র তাঁর মত বদল করেন তাই নয়, তিনি অত্যন্ত খুশি হন; নতুন আবিষ্কারে তাঁর মন উদ্বেলিত হয়, এরপরই তিনি পড়েন বিহারীলাল সরকার, নিখিলনাথ রায় ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থসহ বিভিন্ন বিদেশি***

*গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' প্রথম অভিনীত হওয়ার চার মাসের মাথায় অর্থাৎ জানুয়ারি ১৯০৬ - এন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তবে প্রথম পান্ডুলিপির 'বহুস্থানে' অদল বদল করতে হয়েছিল এবং পুলিশের নিকট থেকে এর ছাড়পত্র পেতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।এমনকি নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে একদিন সকাল সাতটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত পুলিশ অফিসে 'ধর্ণা' দিতে হয়েছিল। এরপরও নাটকটি শেষপর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

***লেখকের বইপত্র। ফলে তাঁর নবচেতনার দ্বারোন্মোচন ঘটে, তিনি সিরাজ সম্পর্কে প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধানে ব্রতী হন, যার ফলশ্রুতি তাঁর ' সিরাজদ্দৌলা'। বাস্তবিক 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক লেখার পেছনে গিরিশচন্দ্রের এই সন্ধিৎসা তাঁর ইতে াপূর্বে রচিত সাহিত্যকর্মে ও সাহিত্যচর্চার ধারায় অনুপস্থিত ছিল। গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনার পরিসরে যে চিন্তা ও মননগত দিকটি ক্রিয়াশীল ছিল, তা খরস্রোতা নদীর মতো সহসা প্রবল বেগে বাঁক নিয়েছিল 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে। পূর্বেকার ধারার সঙ্গে নিজের স্রষ্টাসত্তাকে যেন বিচ্ছিন্ন করেই তিনি 'সিরাজদ্দৌলা' সম্পর্কিত প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন এবং ব্রিটিশ ও দেশিয় মুৎসুদ্দি বুদ্ধিজীবীদের প্রচারিত সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বিদ্ধে বিদ্রোহ করেই লিখেছিলেন এই নাটকটি তাও এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে। 'অন্ধকূপহত্যা' নামক হলওয়েলির কল্পকথার কলঙ্কিত দোষ সিরাজের ওপর চাপানোর অপচেষ্টার বিরোধিতা যেমন তিনি এ নাটকে করেছেন* তেমনই সিরাজের অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক, প্রজা - বৎসল চরিত্রও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁর গৌরবময় সংগ্রামের চিত্রও অঙ্কিত করেছেন। ব্রিটিশরাজশক্তির প্রতি তাঁর দৃষ্টিদৈন্যের কিছু নিদর্শন এই নাটকে স্থান পেলেও নাটকে প্রতিফলিত জাতীয়তাবাদী চেতনাঋদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির মূলগত সরল - রৈখিক স্রোতে তা ভেসে গিয়েছে। তাঁর সিরাজের মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন
যাঁর হৃদয়ে ধারণা, যে স্বদেশী অপেক্ষা বিদেশী আপনার হয়, তাঁর সে ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রম এই উমিচাঁদ আর কৃষ্ণদ াসের প্রতি বিদেশীর ব্যবহার তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। চোখের উপর এই দৃষ্টান্ত দর্শন করে যার ভ্রম দূর না হবে, যে হিন্দু বা মুসলমান স্বার্থচালিত হয়ে স্বদেশের প্রতি ঈর্ষায় বিদেশীর আশ্রয় গ্রহন করবে, সে কুলাঙ্গার! মাতৃভূমির কলঙ্ক! তার জীবন ঘৃণিত! এই দৃষ্টান্ত যদি বঙ্গবাসীর মনে প্রতীত জন্মায়, যে শত দোষে দোষী হলেও স্বদেশী আপনার, বিদেশী চিরদিনই পর, তাহলে আমাদের যুদ্ধশ্রম ও রণব্যয় সফল!

সন্দেহ নেই, সিরাজের মুখে বসানো একথা স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের, এ বক্তব্য পরাধীন দেশের বিবেকী সত্তার।গিরিশচন্দ্রের এই বক্তব্য একদিকে যেমন উনিশ শতকী তথাকথিত বাঙালির নবজাগরণের নেতৃত্বের বিদ্ধে প্রতিবাদের নির্ঘোষ হিসেবে অবয়বিত হয়, তেমন-ই অন্যদিকে জাতীয় আবেগকে সমৃদ্ধ করেছে শতবর্ষ আগে বিশ শতকের প্রত্যূষলগ্নে বাঙলার স্বদেশি আন্দোলনের সূচনাপর্বে। গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা'র সার্থকতা এখানেই।

ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের পুত্র শ্রী ত্রিদিবনাথ রায় তাঁর 'অন্ধকূপহত্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে এ ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠক এ ব্যাপারে ত্রিবিদনাথ রায়ের 'প্রবন্ধমঞ্জুষা গ্রন্থটি (কলকাতা ১৩০৯ বঙ্গাব্দ) দেখতে পারেন।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com